গান না শ্লোগান

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম কথা এই যে যতদিন জাতি আছে, ততদিন একটি জাতীয় সঙ্গীতেরও দরকার। এটা প্রয়োজন কেন প্রয়োজন? কেননা জীবন্ত, বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিরতিহীন প্রচার কার্য্য ছাড়া একটা মনোভাবকেও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সাদা কথায় বলতে গেলে, বিজ্ঞাপন ছাড়া কিছুই চলে না। বিজ্ঞাপন ছাড়া কোনো জিনিস বেচা যায় না, এবং অতি বিরাটভাবে বিজ্ঞাপন না চালালে আমাদের জাতীয়তাবোধ কি দেশপ্রেমও স্তিমিত হয়ে পড়তে বাধ্য।

এই বিজ্ঞাপনে কিংবা প্রোপাগাণ্ডার উপায় বক্তৃতা, খবরের কাগজ, সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও গান। এর মধ্যে গান সব চেয়ে ব্যাপক, সহজ ও তরল। অন্যান্য শিল্পকলার তুলনায় সঙ্গীতের কতগুলো সুবিধে আছে। প্রোপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে সেগুলো খুব বেশি করেই কাজে লাগে।

বিজ্ঞাপনের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান যে-বস্তু আকারে সেটি সবচেয়ে ছোটো। লাগসে একটা শ্লোগান পাওয়া ব্যবসায়ী পক্ষে মহা ভাগ্যের কথা যেমন ধরুন, Player's please.

কি ধরুন, God save the King, God save the king সমস্ত গানটি আপনারা কেউ পড়েছেন? কিংবা ওটি কোন্ ইংরেজ কবির রচনা জানেন? আমি জানিনে। জানিনে বলে আপশোষ নেই।

কিন্তু ভাবুন, ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, নিউজীলণ্ডে ও কানাডায় প্রত্যেকবার সিনেমা শেষ হওয়ার পর ঐ গৎ বাজানো হচ্ছে এবং প্রত্যেক ইংরেজ আধমিনিট দাঁড়িয়ে থাকছে। সেই আধমিনিট কি ইংরেজ সন্তানের চিত্ত রাজভক্তিতে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠছে? প্রশ্নটাই অবাস্তব। কিন্তু এই যে একটি গৎ বাজলো, আর পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সমস্ত ইংরেজ উঠে দাঁড়ালো, তার একটা প্রচণ্ড মূল্য আছে। মূল্যটা ঐক্যসাধনের। সেই আধ মিনিটের গতের প্রোগাগাণ্ডা-মূল্য অসীম। সেটা না থাকলে এত বড়ো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চলতে পারতো না।

আমাদের বন্দোমাতরম্ অতি চমৎকার শ্লোগান। এত ভালো শ্লোগান খুব কম জনেরই আসে। সে-বিষয়ে আমার তো মনে হয়, আমার তো মনে হয়, আমরা অন্যান্য জাতির ঈর্ষার পাত্র হ'তে পারি। উৎকৃষ্ট শ্লোগানের যা-যা গুণ থাকা দরকার সমস্তই এতে আছে। প্রথম কথা, সংস্কৃত কাব্য বলে আওয়াজটা ভারি জমকালো। দ্বিতীয়ত, খুব ছোটো। তৃতীয়ত, এর সার্বজনীনতা প্রায় অকাট্য। স্বদেশকে মা বলাতে কোনো পৌত্তলিকতা নেই, জাতিবিদ্বেষ নেই, প্রাদেশিকতা নেই। অন্যপক্ষে এর ধ্বনিটায় যথেষ্ট তেজ আছে, কর্মে উদ্দীপিত করবার শক্তি আছে এর।

এত ভালো একটি শ্লোগান পেয়ে এবং এতদিন ব্যবহার করে তাপর একে পরিত্যাগ করবার কথা ভাবা যায় না। তাতে একেবারে নিরটে নিছক লোকসান। শ্লোগানের একটা বিশেষত্ব এই যে যত বেশিদিন ধরে ব্যবহার করা যায় ততই তার উদ্দীপক শক্তি বাড়ে। প্লেয়ার্স কোম্পানি কি এখন Players please কে ছাড়তে পারেন? অসম্ভব! তাতে তাঁদের সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

তবে কিনা এর মূল্য শ্লোগান হিসেবে এবং কেবলই শ্লোগান হিসেবে। সমস্ত গানটির কথা উঠলে আলাদা কথা। বন্দোমাতরম্ সমস্ত গানটি আপনারা সম্প্রতি হয়তো অনেকেই পড়েছেন কিন্তু বাজি রেখে বলতে পারি বিশেষ কারণ না - ঘটলে অনেকেই হয়তো পড়তেন না। এবং না পড়লে আপনাদের কাব্যপাঠে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যেতো তা নয়।

যদি বঙ্কিমচন্দ্র আর - কিছু না লিখে ঐ বন্দেমাতরম্ গানটিই শুধু লিখে যেতেন তবে আজ তিনি God save the King-এর রচয়িতার মতোই অখ্যাত থাকতেন। তার মানে এ-কথা বলা নয়, বন্দোমাতরম্ শ্লোগনটি দেশ নিতো না। God save the King -ও নিয়েছে।

কোনো দেশেরই জাতীয় সঙ্গীত কাব্যরচনা হিসেবে মহৎ নয়। বন্দোমাতরম্ও নয়। আদ্ধেক - বাঙলায় আদ্ধেক - সংস্কৃতে লেখা এই সঙ্গীতের সাহিত্যিক মূল্য শূন্য, কি প্রোপাগেণ্ডা মূল্য একেবারে শতকরা একশো। সেই কারণে তা আরও অপরিহার্য।*

প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় সঙ্গীতের মূল্য ও মহিমা তার শ্লোগানে — বাকিটা প্যাডিং। বাকিটা না থাকলেও চলে। বন্দে মাতরম্ -এর শ্লোগানটি অপরিহার্য, বাকিটা নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাঙালির কথা ভেবে যে - গান লিখেছিলেন সমস্ত ভারত সেটা নিয়েছে শ্লোগান হিসেবেই, বন্দেমাতরম্ - ধ্বনি সারা দেশে কত কর্মে প্রেরণা জুগিয়েছে তা আমরা জানি। জাতীয়তাবোধের উত্তাপ সৃষ্টি করবার প্রধান যন্ত্র যখন একবার আমরা পেয়ে গেছি, তখন সেটি কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না— অন্ততঃ, যতদিন জাতীয়তাবোধের প্রয়োজন থাকে।

কিন্তু আজকের দিনে শুধু শ্লোগানটা রেখে বাকিটা ছেঁটে ফেলাই ভালো। তাতে, অন্তত, আমাদের সময় তো অনেক বাঁচবে। যখন কোনো সভা-সমিতির সুরুতে পুরো গানটি দু'-দু'বার গাওয়া হয়, তখন আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে টনটনে পা নিয়েও এ -কথা মনে হয় যে এই সময়টার অন্য যই -কিছুই করা যেতো সেটাই হ'তো ভারতমাতার পক্ষে বেশি সুখের। দেশপ্রেম মূল্যবান, কিন্তু মাত্রাজ্ঞান ব'লেও একটা জিনিস আছে।

'গান না শ্লোগান' প্রবন্ধের তথ্যসূত্র

বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

১২ সংখ্যক চিঠি

Uttarayan
Santiniketan, Bengal
২৮-১৩-৩৭

কল্যাণীয়েষু

বন্দেমাতরং ব্যাপারটা নিয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজে যে উন্মত্ত বিক্ষোভের আলোড়ন উঠেছে[১] আমার বুদ্ধিতে এ আমি কখনো

কল্পনাও করিনি। —গালিগালাজ জিনিসটা চিরপ্রত্যাশিত — বাংলাদেশে যখন জন্মেছি তখন কটুক্তির হিল্লোল উঠলেই অনুভব করি স্বদেশি হাওয়া সেবন করছি। এ নিয়ে কোনোদিন নালিশ— করিনি প্রতিবাদ করিনি। আমার দুঃখিত হবার দিন গেছে কিন্তু বিস্মিত হবার বোধশক্তি এখনো ভোঁতা হয়ে যায়নি। শ্রীহর্ষে বন্দেমাতরংবাদীর পক্ষে তোমার লেখা[২] পড়ে বিস্মিত হয়েছি স্বীকার করি।

স্লোগান -এর কথা উল্লেখ করেছ, বন্দোমাতরং এই ব্যাখ্যাটিতে আছে শ্লোগান্—কন্‌গ্রেস তাকে এবং তার সঙ্গে আরো কিছু ডালপালা ন্যাশনাল সংগীতের কেয়ারিতে রোপন করেছে সুতরাং ও নিয়ে তর্ক তুললে বৃথা উত্তেজনা প্রকাশ করা হয়।

তুমি আমাকে গাল দাওনি। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয় তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও। তর্কটা হচ্ছে এ নিয়ে যে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান— এমন কি ব্রাহ্মও —শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। তুমি কি বলতে চাও, ''ত্বং হি দুর্গা'' ''কমলা কমলদল বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী'' ইত্যাদি হিন্দু দেবী নামধারিণীদের স্তব, যাদের ''প্রতিমা পূজি। [গড়ি] গন্দিরে মন্দিরে,'' সার্বজাতিক গানে মুসলানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুর পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি অইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই। রাগ করে মাথাঝাকানি দিয়ে বলতে পারো এ রকম মনোভাবকে আমরা মানব না। কিন্তু রাগারাগির কথা নয় এ মনোভাব যাদের আছে তারা আমাদের ন্যাশনালিটির একটা প্রধান অঙ্গ, তাদের কাছে হিঁদুয়ানি প্রচার করতে যাও না, কিংবা যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ ভারতের সর্বজনীন স্তবগানে দুর্গানাম বন্ধ রাখলে এতই কী অসহ্য দুঃখ ও ক্ষতি। কালীঘাটে পাঁঠা - বলির পক্ষে স্বকর্ণে এমন যুক্তি শুনেছি–প্রত্যক্ষে ও জন্তুটা একটা পাঁঠা, কিন্তু ভাবের দিকে পাশব রিপুর মূর্তি। তা হোতে পারে কিন্তু বুধগয়ার হাতার মধ্যে ভক্তি হিন্দু পাঁঠাবলির উপলক্ষ্যে সর্বমানবের পাপের বলিদান যখন কল্পনা করে তখন কি বৌদ্ধ উপাসকেরাও পাঁঠা উৎসর্গ করে সর্বজনীন দুর্গাপূজার বারোয়ারিতে যোগ দিতে পারে— আর না পারলেই ভক্তের দল ক্ষোভে ধিক্কারে বুক চাপড়িয়ে মরবে।

''কবিতা'' পত্রিকায় কবিতা সম্বন্ধে গদ্যপ্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেছিলে। কলমও ধরেছিলুম। কিন্তু দেশের মেজাজ দেখে দ্বিধা হোলো মনে। এখন যা লিখতে যাব মতের সঙ্গে না মিললেই হিংস্রতা জেগে উঠবে। এ রকম ঝোড়ো হাওয়ার মুখে পাল নামিয়ে দিয়ে চুপচাপ ঘাটে বসে থাকাই ভালো।

রচনায় এখনো মন চলে কিন্তু হাত চালাতে ক্লান্তি আসে। নিজের হস্তাক্ষরে চিঠিখানা শোভন হয়নি[৩]—পরের হাত থেকে অক্ষর ধার নিতে হোলো।

এই চিঠিখানা প্রকাশ করবার জন্যে নয় সে কথা বোধ হয় বলা বাহুল্য। ইতি

২৮/১২/৩৭ [পৌষ ১৩৪৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩- সংখ্যক চিঠি

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠিখানা[১] পড়ে আশ্বস্ত হলুম। মূঢ়তা সবচেয়ে লজ্জাকর— বন্দেমাতরম্ ব্যাপার নিয়ে দেশে জুড়ে যে ঘোলা বুদ্ধির দৃস্য দেখা গিয়েছে সম্পাদকীমহলে সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। ভিড়ের লোকের ভাবাবেগের কুয়াশার মধ্যে তাদের সঞ্চরণ, চারিদিকে যেই একটা অন্ধ হৈ হৈ ওঠে অমনি তাদের মনের স্বচ্ছতা ঢাকা পড়ে। তুমি সাহিত্যিক, আমাদের স্বশ্রেণীয়, তোমার বুদ্ধিতে আঁধি লেগেছে কল্পনা করে আমি বিচলিত হয়েছিলুম, অন্যদের সম্বন্ধে আমি তো চুপ করেই ছিলুম।

তোমার অনুরোধ রক্ষা করেছি কষ্টে— লোকের ভিড়, কাজের ভিড়, তার উপরে দেহমনের দুর্বলতা।

৪/১/৩৮ [২০পৌষ ১৩৪৪] ইতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The darkaness of night
is in harmony with day,
The morning of mist is
dicordant

কার্ডের পিছনে এ লেখাটা ছিল গোচরে আসেনি, আশ্চর্য এই, লেখার প্রসঙ্গে সঙ্গে অমানান হয়নি।

---

১. বুদ্ধদেব বসুর ৯ সংখ্যাক চিঠি দ্রষ্টব্য।

উৎস - চিঠিপত্র ১৬ প্রকাশ : ৭ পৌষ ১৪০২, বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র। পত্রসংখ্যা ১২ এবং ১৩, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৭, প্রকাশন - বিশ্বভারতীয় গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুদ্ধদেব বসুর পত্র—

৯ সংখ্যক চিঠি

As from

202 Rashbehari Avenue
Ballygunge, Calcutta
Jan 1, 1938

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুসি হলাম। শ্রীহর্ষে প্রবন্ধ যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে লিখতে পারিনি, সে - কথা সত্যি। বন্দে মাতরং গানটি সমগ্রভাবে নিলে অহিন্দু ভারতের একেবারেই অযোগ্য, এ-কথা কি আজকের দিনে নতুন ক'রে বলবার? 'ত্বং হি দুর্গা' প্রভৃতি পংক্তি আমার তো মনে হয় প্রগতিপন্থী হিন্দুও গ্রহণ করতে পারবে না, কেননা ওর ভিতর থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার উদগীরণ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার ছোটো লেখাটি আপনার যদি 'বন্দে মাতরংবাদী' মনে হ'য়ে থাকে, আমার লেখনীর অপটুতাই নিশ্চয়ই তার জন্য দায়ী। আমি বলতে চেয়েছি এইটুকু যে স্লোগান হিসেবে বন্দে মাতরং বাক্যটি একদিন নিয়ম অনুসারেই আপাতত

থাকবে। স্বদেশকে মা ব'লে কল্পনা করার অভ্যেস পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যেই দেখা যায়, ওতে কোনো বিশেষ ধর্মের সংস্কারে আটকাবে না। কিন্তু সমস্ত গানটা গ্রহণীয় নয়, কংগ্রেস এবারে যেটুকু ছেঁটেছেন, তার অনেক বেশি ছেঁটে ফেললেও কোনো ক্ষতি নেই; সমস্ত রচনাটির মধ্যে বন্দে মাতরং বাক্যটি শুধু মূল্যবান। মূল্যবান আর কোনো কারণে নয়, ভারতের গত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়ে এসেছে বলে।

বলতে পারেন, যদি সমস্তই ছেঁটে ফেললে তবে রাখলে কী, এবং রাখলেই বা কেন? এটা দেখা যায় যে জাতীয় সঙ্গীত আসলে সঙ্গীত নয়, কোনো স্বাধীন সুস্থ জাতি আধ ঘন্টা ধ'রে ন্যাশনাল গানের উত্তেজনা পরিবেষণ করে না, আধ মিনিটেই নিয়মরক্ষা করে। তাছাড়া, জাতীয় সঙ্গীত আমাদের দেশেই গাওয়া হয়, অন্য সব দেশে বাজানো হয়; এতেই বোঝা যায় যে জাতি-গঠনে ও রক্ষণে সব চেয়ে অগ্রণী যারা তারা ন্যাশনাল গানের কথাগুলোকে বিশেষ মূল্য দেয় না। কথার মূল্য শুধু সেখানেই, যেখানে আমরা একটা পংক্তিকে স্লোগান বা War-cry হিসেবে ব্যবহার করি। সেদিক থেকে বন্দে মাতরং বাক্যটি ভারতের যথেষ্ট কাজে লেগেছে, ও-কথাটা চ্যাঁচাবার পক্ষে ভালো, সাধারণের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডার উপযোগী। অবশ্য স্লোগান হিসেবেও বন্দে মাতরং একদিন অচল হ'য়ে পড়বে –তখন তার নিজেরই জীবনীশক্তি শেষ হবে, হাজার আনন্দবাজারের অশ্রুজলসেচনেও আর বাঁচবে না।

শ্রীহর্ষে বিস্তৃতভাবে বলতে পারিনি, এখানে বলি। আসল ব্যাপারটা অন্যরকম। ইংরেজ ভারতে 'ইতিহাসের হাতিয়ার' বই কিছু নয়। ভারতের বাদশাহী ফিউডালিজম্-কে ধ্বংস ক'রে ইংরেজ আনলে নতুন যুগ, আনলে ক্যাপিট্যালিজম্। ভারতে যা ছিল না, সেই বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করলে তারা। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট সূত্রপাতে এই বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা—বড়ো চাকরিতে, বড়ো ব্যবসায় শিল্পে বাণিজ্যে প্রবেশের চেষ্টা– অর্থাৎ যে - যে উপায়ে তোমরা ভারতের ধন শোষণ করছো তাতে আমাদেরও কিছু ভাগ দাও। পেলুম আমরা ভাগ, নেটিব বুর্জোয়ার প্রতিষ্ঠা হ'লো, এবং সেই বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পূর্ণই হিন্দু (হিন্দু বলতে ব্রাহ্মও বুঝছি।) বন্দে মাতরং হ'লো এই লিবারেল বুর্জোয়া হিন্দুর সঙ্গীত— এবং যেহেতু আমাদের জাতীয় আন্দোলন এখনো মোটামুটি এই বুর্জোয়ার যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়, সেই কারণেই এখনো বন্দে মাতরং -এর কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তি রয়েছে। ভারতীয় ধনতন্ত্র বিদেশী ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে উদ্যত– এই তো আমাদের স্বাধীনতা- সংগ্রামের মূল কথা। কিন্তু দেশের বেশির ভাগ লোকের পক্ষে এ - আন্দোলনের কোনো অর্থ নেই। যারা ধানক্ষেতে পাটক্ষেতে এবং শহরের কলকারখানায় খেটে মরছে, না - খেটে মরছে—এ -আন্দোলন তাদের নয়, এ আন্দোলনে জয়ী হ'লেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই সমস্তটা লাভ, তাদের বিশেষ - কিছু সুবিধে হবে না। তাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, কিন্তু তারা তাদের হিন্দুত্ব কি মুসলমানত্বের জন্য মোটেও চিন্তিত নয়, পেট ভ'রে খেতে পাওয়ার চেয়ে বড়ো জিনিস কিছু নয় তাদের পক্ষে। এবং বন্দে মাতরং 'মন্ত্র' ও তাদের নয়; এটা দেখাই যাচ্ছে যে ভারতের শ্রমিকরা কখনো বন্দে মাতরং উচ্চারণ করে না। আপনার কি মনে হয় না আমাদের জাতীয় আন্দোলনের চেহারা একদিন বদলে যাবে; যখন যুদ্ধটা হবে ইংরেজ আর ভারতীয়ের মধ্যে নয়, যে-ধনতন্ত্রের ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়েই অংশীদার তার সঙ্গে দেশব্যাপী বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর। তখন বন্দে মাতরং -এর কোনো মূল্যই থাকবে না, তখন সেই ান্দোলন সৃষ্টি করবে নতুন সঙ্গীত, নতুন স্লোগান।

আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে হিন্দু কম্যুনালিজম মুসলমান কম্যুনালিজম -এর চেয়ে কিছুমাত্র কম হিংস্র নয়, এবং বাঙলাদেশে যেহেতু হিন্দুরাই ধনী তাদের হিংস্রতা বরঞ্চ বেশি কার্য্যকরী। এই উন্মত্ত আবহাওয়ার এ-সব বিষয়ে মনের কথা প্রকাশ্যভাবে বলতে ভয়ই করে; তা ছাড়া কোনো স্বাধীন ও সুস্থ পত্রিকাও নেই যার ভিতর দিয়ে বলা যায়। তবু সাহস ক'রে কাউকে কখনো - কখনো বলতেই হবে; এবং এরকম সঙ্কটে আমরা আপনার নেতৃত্বেরই প্রত্যাশা করি। উপরে আমি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের যে - ব্যাখ্যা দিলুম তা আপনার কেমন লাগবে জানিনে; কিন্তু আপনি যে একবার বলেছিলেন, 'অন্ন চাই, আলো চাই...চাই স্বাস্থ্য...' কংগ্রেসের চেষ্টা কি সেদিক দিয়ে গেছে, নাকি বিশেষ একটা শ্রেণীকে ভালো - ভালো চাকরিতে ও বড়ো বড়ো ব্যবসায় বসাবার চেষ্টাতেই এ - পর্য্যন্ত ভারতে হয়নি, কিন্তু ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি অনুসারে একদিন সেটা হ'তে বাধ্য।

আজ ভারতবর্ষ—বিশেষ করে বাংলাদেশ— হিন্দু - মুসলমান সমস্যায় দ্বিখণ্ডিত ও পীড়িত, এ - জিনিসটা যেন আমাদের সমস্ত প্রাণশক্তি শোষণ ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু এরও আর একটা দিক আছে। মুসলমানরা বেশির ভাগই নিরক্ষর, ভূজীবী ও অত্যন্ত দরিদ্র, হিন্দুরা ধনী ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত। সুতরাং এই বিরোধ ক্রমে শ্রেণী - বিরোধে দাঁড়াতে পারে, বিরোধের ভিত্তিটা যে ইকনমিক তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এবং এই নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমান চাষী যদি আজ আত্মসচেতন হ'য়ে ওঠে তবে সে বন্দে মাতরংকে গ্রহণ করবে না, তাতে হিন্দুয়ানী আছে ব'লে নয়, তার আদর্শের সঙ্গে তার প্রাণের যোগাযোগ নেই ব'লে। সঙ্গে - সঙ্গে হিন্দু চাষী সম্বন্ধেও সেই কথা। সুজলাং সুফলাং দেশমাতৃকা ভালো- খেতে-পাওয়া ভদ্রলোকের অবসরের বিলাস; ক্ষুধিত চাষীর পক্ষে স্বদেশপ্রেম কি জাতীয়তার কোনো মূল্য নেই, ও -সব বস্তুকে সে ধনবানের আত্মস্ফীতির উপায়ান্তর ব'লেই ভাববে— এবং ঘৃণা করবে।

আপনার চিঠি পেয়ে উৎসাহের ঝোঁকে এত কম লিখে ফেললুম। এ - চিঠির যদি দয়া ক'রে উত্তর দেন তবে বুঝতে পারবো এই বিশ্লেষণে কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা। এ-সমস্ত বিষয় আপনার কী মনে হয় তা জানতে খুব কৌতূহলও হয়। পরিশেষে নিবেদন এই 'কবিতা'র গদ্য সংখ্যার জন্য একটি প্রবন্ধ আপনার চাই-ই।' এদশের মেজাজ আনন্দবাজার দিয়ে বিচার করা চলে না। আমি তো আমার সমসাময়িক তরুণ বাঙালির মধ্যে—তার মধ্যে মুসলমানও রয়েছে— সত্যিকারের বুদ্ধিসম্পন্ন কয়েকটি মানুষ দেখতে পাই; তবে দুঃখের কথা এই যে উপযুক্ত বাহনের অভাবে তাদের মতামত বেশি প্রচারিত হয় না। কবিতার সঙ্গে জীবনের ও সমাজের যোগাযোগ সম্বন্ধে আপনার কথা শুনতে আমরা উৎসুক—আপনি আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

আপনি আমার প্রণাম জানবেন

ইতি

[১৭ পৌষ ১৩৪৪] বুদ্ধদেব

উৎস - চিঠিপত্র ১৬, প্রকাশ ৭ পেষ ১৪০২, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুদ্ধদেব বসুর পত্র, পত্রসংখ্যা ৯, পৃষ্ট ১৭৬-১৮০) বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলিকাতা।

সূত্রাবলি

১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্গত 'বন্দোমাতরম' সংগীতে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই গানটি বহুবছর ধরে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা জুগিয়েছে বাঙালির মনের। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় গানটিকে একসময় 'ইসলামবিরোধী' বলে মনে করেন, যার

ফলে জাতীয় সংগীত হিসেবে গানটি গৃহীত হতে পারে কি না, এ বিষয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনা করতে হয়। সেই আলোচনার আগে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নেওয়া হয়। আলোচনায় স্থির হয়, গানটির প্রথম স্তবক সভা - সম্মেলনে গাওয়া যেতে পারে, তবে জাতীয় সংগীত হিসেবে অন্য গান গ্রহণ করা হবে। এই সিদ্ধান্তকে আনন্দবাজার পত্রিকা ''বন্দেমাতরম সঙ্গীতে'র সমাধি রচনায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেন। এ বিষয়ে 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল:

ক. 'যুগান্তর' পত্রিকায় ১৩৪৪ -এর ১৩-১৪ কার্তিক দুদিনই সম্পাদকীয় রচনার শীর্ষে রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়: ''বন্দেমাতরম'' সঙ্গীতের প্রথমাংশ একটা পৃথক সত্তায় পরিণত হইয়াছে, ইহার মধ্যে একটা নিজস্ব অনুপ্রেরণার শক্তি আছে। সুতরাং উহা কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নিকট আপত্তিকর হইতে পারে না। '(২৬.১০.৩৭)

খ. আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩ কার্তিক, ১৩৪৪) 'বন্দেমাতরম' সংগীত বিষয়ে কবির বিবৃতি:

' ''বন্দেমাতরম'' সঙ্গীতকে জাতীয় - সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি না, দুঃখের বিষয় সেই সম্পর্কে এক প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমাকে ঐ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সময় মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহার প্রথম প্যারাতে সুর সংযোজনা করার সুযোগ আমারই প্রথম হইয়াছিল। তখনও এই সঙ্গীতের রচয়িতা জীবিত ছিলেন। কলিকাতার আহূত একটি কংগ্রেসে আমিই প্রথম উহা গান করি। ঐ সঙ্গীতের প্রথম প্যারাতে যে ভক্তি ও কোমলতার ভাব আছে, উহাতে ভারতমাতার যে সুন্দর রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আমার চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহার ফলে আমার পক্ষে ঐ সঙ্গীতের প্রথম প্যারাকে সমগ্র সঙ্গীত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কিংবা যে পুস্তকে উহা প্রকাশিত হয় তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোনো অসুবিধা হয় নাই। অবশ্য আমি আমার পিতৃদেবের এক - ব্রহ্মবাদের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হওয়ার সমগ্র সঙ্গীতটির প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা ছিল না। শাসকগণ আমাদের প্রবেশে দ্বিধা - বিভক্ত করায় আমরা যখন জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করি, সেই সংগ্রামের সময় ইহা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে প্রচলিত হয়। পরবর্তী সময়ে ''বন্দেমাতরম'' যখন জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়, তখন উহার জন্য আমাদের বহু বিশিষ্ট বন্ধু যে বিরাট স্বার্থত্যাগ করিয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারি না কারণ, আমাদের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার সংগ্রামে সাফল্য - লাভের পক্ষে উহার প্রয়োজন আজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু আমি অনায়াসে স্বীকার করি যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র '' বন্দেমাতর'' সঙ্গীতটি যদি উহার অন্যান্য ইতিহাসের সাহিত্য পড়া যায় তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় যাহার ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় সঙ্গীত যদিও সমগ্র সঙ্গীত হইতে দুইটি প্যারা মাত্র, তথাপি ইহা যে স্বদা কেন সমগ্র সঙ্গীতের কথা স্মরণ করিইয়া দিবে কিংবা যে ইতিহাসের সাহিত্য দৈবক্রমে ইহবা জড়িত তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে কিংবা যে ইতিহাসের সহিত দৈবক্রমে ইহা জড়িত তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। উহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে এবং উহার নিজস্ব এমন একটা উদ্দীপনাময় বৈশিষ্ট্য আছে যাহা, আমার মনে হয়, কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মনে আঘাত করে না'

—'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৩ কার্তিক ১৩৪৪ (৩০ অক্টোবর ১৯৩৭)

১৪ কার্তিক ১৩৪৪ -এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হল—

'...মুসলিম বন্ধুদের আপত্তি' —অপ্রকাশ্য গোপন আপত্তি পুরণ করিবার জন্য এবং ভারতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বুক হইতে বেদনা শল্য তুলিয়া লইবার জন্য এত পরামর্শ এত দুশ্চিন্তা—এমন কি বৃদ্ধ করিবারের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিবার পরও, তাঁহাদের পছন্দসই অংশটুকুকে প্রত্যেক জাতীয় সম্মেলনে এবং কংগ্রেসে আবশ্যিক জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন না কেন?'

৩০ কার্তিক ১৩৪৪ -এ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় :

'রবীন্দ্রনাথ ''বন্দোমাতরম'' সঙ্গীতের ব্যবচ্ছেদের সম্মতি দিলেও বাংলার অন্যান্য প্রবীণ সাহিত্যিকগণ স্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনার প্রতি এই অসম্মানের প্রতিকারার্থে সমবেত হইয়াছেন ইহা আশার কথা। বঙ্গিমচন্দ্রের রচনায় হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহার কুফল যে শেষপর্যন্ত তাঁহার উপরে আসিয়াও বর্ত্তাইতে পারে ইহা সম্ভবত ঃ তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। টেকসই বুক কমিটি হইতে তাঁহার রচনার অংশ - বিশেষ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের জন্য প্রস্তাব করিলে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়া প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধেও সেই যুক্তি এবং সেইরূপ প্রতিবাদই তিনি করিবেন আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি না করিলেও বাংলার অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সাহিত্যগুরুর সম্মানরক্ষায় সচেষ্ট হইলেও সে চেষ্টা সার্থক হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস করি...'।

'উন্মত্ত বিক্ষোভের আলোড়ন' প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীনেপাল মজুমদারের 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনার্থ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড (১৯৭১), পৃ ২৪৫-৬৮।

২. 'শ্রীহর্ষ', নভেম্বর ১৯৩৭ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর 'গান না শ্লোগান' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয় (পৃ. ২১১ - ১২)

উৎস : চিঠিপত্র ১৬, প্রকাশ ৭ পৌষ ১৪০২, সূত্রাবলি: বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রনাথ, পত্রসংখ্যা ১২, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৬।